

জাকাতের প্রাচীন দুই খাত, আধুনিক দুই সংকট

ড. এম কবির হাসান

আমার দেশ, ২.১০.২৬

গত বছরের আগস্টে *পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের* এক জরিপে দেখা যায়, *বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার আবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে*—২০২২ সালে বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপে যা ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

অতিদারিদ্র্য ৫ দশমিক ৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

★★অথচ এ দেশে জাকাতের বার্ষিক সম্ভাব্য পরিমাণ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার হিসাব ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা, কারো মতে আরো বেশি।★★

আর *ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীন সরকারি জাকাত ফান্ডে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জমা পড়েছিল ১০ কোটি ২১ লাখ টাকা।*

এই দুই সংখ্যার ব্যবধান নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু সমস্যাটি শুধু আদায়ের পরিমাণের নয়। সমস্যা জাকাতের বণ্টন-কাঠামোয়ও।

সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াত জাকাত ব্যয়ের আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এর মধ্যে সপ্তম খাত ‘ফি-সাবিলিল্লাহ’ এবং অষ্টম খাত ‘ইবনিস-সাবিল’ বাংলাদেশে কার্যত অব্যবহৃত। মজার বিষয় হলো, আজকের বাংলাদেশের সবচেয়ে দৃশ্যমান দুটি সংকটের সঙ্গে এই দুই খাতেরই সবচেয়ে সরাসরি সম্পর্ক।

★‘ইবনিস-সাবিল’ শব্দের আভিধানিক অর্থ পথের সন্তান সেই মুসাফির, যিনি নিজ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথে অসহায় হয়ে পড়েছেন।★★

জমন্ডর ফকিহদের মত, তিনি ধনী হলেও জাকাত পাওয়ার অধিকারী, কারণ সম্পদ থাকা আর সম্পদ ব্যবহার করতে পারা এক জিনিস নয়। এই সংজ্ঞাটি আজ বাংলাদেশে বিমূর্ত নয়, বরং ভয়াবহ রকম বাস্তব।

★★কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা নিজ দেশের ভিটেমাটি থেকে বিচ্ছিন্ন।★★ আইওএমের প্রথম জাতীয় জরিপ অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগে— *★বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে—অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৪৯ লাখ ৫৫ হাজার।*★ নদীভাঙনে যিনি ভিটে হারিয়েছেন, কাগজে-কলমে যার জমি এখনো আছে কিন্তু বাস্তবে নেই—ফিকহের পরিভাষায় তিনি ঠিক সেই ব্যক্তি, যার কথা ইমাম তবারি ও ইবনে জায়েদ বলেছিলেন।

হানাফি ইমামদের একাংশ এই খাতকে আরো প্রসারিত করেছেন:

যে ব্যবসায়ীর পাওনা আটকে আছে, আদায় করতে পারছেন না, তিনিও কার্যত ফকির— ‘ইবনিস-সাবিল’-এর মতোই।

হাশলি মাজহাবের কেউ কেউ রাস্তায় আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল মানুষকে এই খাতে গণ্য করেছেন। আল-মানার তাফসিরের প্রণেতা সাইয়েদ রশিদ রিজা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদেরও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। অর্থাৎ শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত, পথশিশু, ছিন্নমূল—চতুর্দশ শতাব্দীর পরিভাষায় লেখা একটি খাত একুশ শতকের একটি পুরো সামাজিক নিরাপত্তা-শ্রেণিকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।

এই খাতটি কখনোই নিছক তাত্ত্বিক ছিল না। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একটি ঘর নির্দিষ্ট করে সেখানে আটা, খেজুর ও পানি মজুত রেখেছিলেন— নিঃস্ব পথিক ও অতিথিদের জন্য; মক্কা-মদিনার দীর্ঘ পথেও একই ব্যবস্থা করেছিলেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজের নির্দেশে ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি যে দলিল লিখেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, *প্রতিটি পথে চলাচলকারী মানুষের সংখ্যার অনুপাতে এই খাতের অর্থ বণ্টিত হবে এবং আশ্রয়হীন পথিককে স্থানীয় নির্ভরযোগ্য পরিবারের জিম্মায় দিতে হবে। অর্থাৎ সপ্তম শতকেই এটি ছিল একটি পরিকল্পিত, বরাদ্দভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা—আজকের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে চাহিদানির্ভর বাজেটিং।*★*

‘ফি-সাবিলিল্লাহ’ নিয়ে বিতর্ক বেশি জটিল। চার মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহ একে জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজে সীমিত রেখেছেন। বিপরীতে ইমাম রাজি, রশিদ রিজা, শায়খ মাহমুদ শালতুত, সাইয়েদ সাবেক ও ইউসুফ আল-কারজাভি শব্দটির মূল আভিধানিক অর্থ ধরে একে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে প্রসারিত করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও এই প্রসারিত পাঠ স্বীকৃতি পেয়েছে: মক্কার ইসলামি ফিকহ একাডেমির অষ্টম অধিবেশন (১৪০৫ হিজরি) এবং কায়রোয় অনুষ্ঠিত জাকাতের সমসাময়িক বিষয়াবলিবিষয়ক প্রথম সিম্পোজিয়াম (১৪০৯ হিজরি/১৯৮৮) দাওয়াহ, শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমকে এই খাতের আওতাভুক্ত বলে রায় দিয়েছে।

এখানে একটি সৎ সতর্কতা জরুরি। প্রসারিত পাঠের বিরুদ্ধে *ফকিহদের আপত্তি দুটি এবং দুটিই গুরুত্বপূর্ণ।*

প্রথমত, হানাফি মতে ‘তামলিক’—অর্থাৎ প্রাপককে মালিক বানিয়ে দেওয়া—জাকাতের রুকন; মালিকবিহীন প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করলে সে শর্ত পূরণ হয় না।

দ্বিতীয়ত, আয়াতে ‘ইন্মামা’ শব্দটি খাতগুলোকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে; ‘ফি-সাবিলিল্লাহ’কে অসীম অর্থে নিলে বাকি সাতটি খাতের সীমা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ আপত্তি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। অভিজ্ঞতা বলে, খাতটি যখন সবকিছুর খাত হয়ে যায়, তখন তা কার্যত কোনো খাতই থাকে না—এবং দরিদ্রের প্রাপ্য অংশই সংকুচিত হয়।

তবে উত্তরও আছে। *আয়াতে যে চারটি খাত ‘ফি’ অব্যয় দিয়ে এসেছে— দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথ ও পথিক* সেখানে ব্যক্তিমালিকানা হস্তান্তরের শর্ত আরোপিত হয়নি।

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে জাকাত ব্যয় জায়েজ বলে যারা ফতোয়া দিয়েছেন, তারা নিজেরাই তামলিকের ব্যতিক্রম স্বীকার করেছেন। আর রাষ্ট্র বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যখন জাকাত গ্রহণ করে, তখন তা গ্রহণ করে প্রাপকদের প্রতিনিধি হিসেবেই। কাজেই প্রশ্নটি নীতিগত জায়েজ-নাজায়েজের নয়; প্রশ্নটি শৃঙ্খলার। প্রসারিত পাঠ গ্রহণ করলে তার সঙ্গে কঠোর হিসাবরক্ষণ ও বরাদ্দসীমা বেঁধে দেওয়া অপরিহার্য।

প্রসারিত পাঠ মেনে নিলে ‘ফি-সাবিলিল্লাহ’ খাতে বাংলাদেশে কী অর্থায়ন হতে পারে? বাস্তবসম্মত তালিকাটি ছোট রাখাই ভালো : দরিদ্র শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, ইসলামি অর্থনীতি এবং শরিয়াহ-নিরীক্ষার মতো ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি এবং নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভাতা—রশিদ রিজা যে শর্ত দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা এ কাজে নিয়োজিত থাকায় অন্য পেশায় উপার্জন করতে অক্ষম। সচ্ছল আলিমের জ্ঞানবিতরণের জন্য এ খাত থেকে অর্থ নেওয়ার সুযোগ তিনি রাখেননি। এ ধরনের নির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য তালিকা না থাকলে খাতটি দ্রুতই প্রশাসনিক ব্যয়ের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়, যা দরিদ্রের প্রাপ্য অংশেই ভাগ বসায়।

এবার আসল প্রশ্ন : সরকারি জাকাত ফান্ডে বছরে মাত্র ১০ কোটি টাকা জমা পড়ে কেন? উত্তরটি ধর্মতত্ত্বে নেই, প্রাতিষ্ঠানিক আস্তায়। দাতা জানেন না তার টাকা কোথায় গেল, কে পেল, কত খরচ হলো প্রশাসনিক ব্যয়ে। নিরীক্ষিত ও প্রকাশিত হিসাব নেই; আটটি খাতভিত্তিক আলাদা হিসাবরক্ষণ নেই; স্বাধীন তদারকি নেই। ফলে ধর্মপ্রাণ মানুষ আত্মীয়স্বজন বা পাড়ার মাদরাসায় সরাসরি দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এটি অযৌক্তিক আচরণ নয়, বরং তথ্যের অসমতার যুক্তিসংগত ফল।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রীয় জাকাত কর্তৃপক্ষ যে আদায় বাড়াতে পেরেছে, তার কারণ ধর্মীয় উদ্দীপনা নয়—নিয়মিত নিরীক্ষা, প্রকাশ্য প্রতিবেদন ও কর-সমন্বয়ের সুস্পষ্ট বিধান।

করণীয় কী? স্বল্প মেয়াদে সরকারি জাকাত ফান্ডের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা যায়— আটটি খাতে পৃথক বরাদ্দসহ। মধ্য মেয়াদে প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র আইন ও একটি স্বায়ত্তশাসিত জাকাত কর্তৃপক্ষ, যা রাজস্ব বিভাগের অধীন নয় এবং যার পরিচালনা পর্ষদে আলিম, হিসাববিদ ও নাগরিক প্রতিনিধি থাকবেন। বেসরকারি জাকাত সংস্থাগুলোকে বন্ধ না করে বরং একটি অভিন্ন নিবন্ধন ও প্রতিবেদন মানেরত আওতায় আনা উচিত; প্রতিযোগিতা আস্তার শত্রু নয়, অস্বচ্ছতাই শত্রু। আর দীর্ঘ মেয়াদে দরকার একটি জাতীয় শরিয়াহ পর্ষদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা—‘ফি-সাবিলিল্লাহ’ ও ‘ইবনিস-সাবিল’ খাতে কোন কোন ব্যয় গ্রহণযোগ্য, তার একটি সীমিত ও যাচাইযোগ্য তালিকা।

★★বৈশ্বিক হিসাবেও ছবিটি একই। ইউএনডিপি'র উদ্ধৃত গবেষণা অনুযায়ী বিশ্ব বার্ষিক জাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ ২০ হাজার কোটি থেকে ১ লাখ কোটি মার্কিন ডলার।★★

একই সময়ে রোহিঙ্গা সহায়তায় জাতিসংঘের ২০২৬ সালের আবেদন গত বছরের চেয়ে ২৬ শতাংশ কম।

পশ্চিমা সাহায্য সংকুচিত হচ্ছে; মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব সম্পদ অসংগঠিত থেকে যাচ্ছে। এই দুটি বাক্য পাশাপাশি রাখলে নীতিনির্ধারণের কাজটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমস্যা এই নয় যে কোরআনের নির্ধারিত খাতগুলো আধুনিক যুগের জন্য অপ্রতুল হয়ে পড়েছে।

সমস্যা এই যে আমরা আটটির মধ্যে ছয়টি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি, আর যে দুটি খাত আজকের বাস্তবায়ন, শরণার্থী ও ছিন্নমূল মানুষের জন্যই যেন তৈরি, সে দুটিকে অব্যবহৃত ফেলে রেখেছি। ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারই এখানে বেশি জরুরি। *কারণ জাকাতের বিধানে কোনো ঘাটতি নেই; ঘাটতি আছে আমাদের ব্যবস্থাপনায়।*

লেখক: ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্সের অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিভাগের অর্থায়নবিষয়ক অধ্যাপক এবং মফেট চেয়ার। তিনি একজন সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার, ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থায়নে ২০১৬ সালের আইএসডিবি পুরস্কারপ্রাপ্ত, এএওআইএফআইয়ের এথিকস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স বোর্ডের সদস্য এবং এর এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান।